‘চির উন্নত মম শির’ : বৈদেশিক সাহায্য কমিয়ে এগোচ্ছে বাংলাদেশ

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে তখন উদয়াস্ত পরিশ্রম করছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই ক্রান্তিকালে ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি এক সভায় জাতির পিতা আফসোস করে বলেছিলেন, ‘দুনিয়া ভরে চেষ্টা করেও আমি চাল কিনতে পারছিনা। চাউল পাওয়া যায় না। যদি চাউল খেতে হয় আপনাদের পয়দা করেই খেতে হবে’। সেই রিক্ত বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ৩৬০ লাখ টন চাহিদার বিপরীতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশে উৎপাদিত হয়েছিল ৩৮৬.৯৫ লাখ মে. টন চাল। আর মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৫৩.৪৩ লাখ মে. টন। সেই বাংলাদেশ আজ আর দানের ওপর নির্ভর করে না।

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত। দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ায় বৈদেশিক সহায়তায় অনুদানের পরিমাণ এখন ন্যূনতম পর্যায়ে নেমেছে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ফলে এখন আর খাদ্য সহায়তার প্রয়োজন হচ্ছে না। বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করায় খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন হয় না। এছাড়া, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অনুদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ বা সংস্থা হতে মূলত খাদ্য সহায়তা, পণ্য সহায়তা এবং প্রকল্প সহায়তা পেয়েছে। অর্থবছর ১৯৭৩ এ প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তার শতকরা ৮৫.৫০ ভাগ ছিল খাদ্য ও পণ্য সহায়তা এবং ১৪.৫০ শতাংশ ছিল প্রকল্প সহায়তা। মোট সহায়তার শতকরা ৮৮.২০ ভাগ ছিল অনুদান এবং ১১.০৮ শতাংশ ছিল ঋণ। সেই চিত্র পাল্টে গিয়েছে।

বাংলাদেশে এখন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্য সহায়তারও প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তার প্রায় পুরোটাই প্রকল্প সহায়তা যা ২০২০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৯৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ। ২০০৯-১০ সালে দেশে অনুদান এসেছে ৩০ শতাংশের মতো, ৭০ শতাংশের মতো আসল ঋণ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুদান এসেছে সর্বোচ্চ পাঁচ শতাংশের মতো, আর ঋণ হিসেবে এসেছে ৯৫ শতাংশ।

বর্তমানে বৈদেশিক সহায়তার প্রায় পুরোটাই প্রকল্প সহায়তা হিসেবে আসছে। পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে বৈদেশিক সহায়তার উপর নির্ভরশীলতা কমে গিয়ে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু তো আমরা নিজেদের টাকায় করেছি। তার মানে, এডিপি বাস্তবায়নে বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু করে দিয়েছি । এডিপির আকার ও গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

এখানে আশার পথ দেখাচ্ছে আরো একটি পরিসংখ্যা ন। তা হলো , আমাদের নিজস্ব বিনিয়োগ এত বেড়ে গেছে যে, বাইরের ঋণ এলেও এটা শতাংশের হারে অনেক নিচে। এডিপিতে ১৯৮৯-৯০ সালে এই হার ছিল ৬৩.৮০ শতাংশ, ২০১৮-১৯ এ তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৯.২৫ শতাংশে। আর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপির পরিমাণ ছিল এক লাখ ৭৬ হাজার ৬২০ কোটি টাকা, এতে বৈদেশিক সহায়তা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫১ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্য বাড়লেও আগের তুলনায় শতকরা হিসেব নেমে এসেছে ২৯ দশমিক ২৫-এ।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন আসতেই পারে, কি পরিমাণ ঋণ নিলে একটি দেশ ঝুঁকিতে পড়ে যাবে? স্বতসিদ্ধ অঙ্ক হলো, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ জিডিপি’র ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ঝুঁকিমুক্ত। আমাদের দেশে ২০২০ অর্থবছর শেষে এই সূচকের অবস্থান জিডিপি ’র মাত্র ১৫.৪৭ শতাংশ। এর একটাই ব্যাখ্যা , বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহের পরিমাণ বাড়লেও ধারণক্ষমতার সূচকে বাংলাদেশ অনেক নীচেই রয়েছে। আমরা গতবছর বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করেছি রাজস্ব আয়ের ১০.২৪ শতাংশ। অথচ ঝুঁকিসীমা কিন্তু অনেক উপরে, ২০ শতাংশ। তার মানে আমরা এই সীমার অনেক নীচে নিরাপদ জোনেই আছি। ‘আমাদের ঝুঁকি নেই। বৈদেশিক ঋণ যখন জিডিপির

৪০ শতাংশ বা এর বেশি হয়ে যায় , তখন ঝুঁকি থাকে। আমাদের জিডিপির তুলনায় বৈদেশিক ঋণ হলো ১৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ।' প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ পরিশোধ, উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ খুব স্বাচ্ছন্দ অবস্থধানেই আছে।

সম্প্রতি মন্ত্রিসভাকে অবহিত করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক সহায়তা বিষয়ে যে প্রতিবেদন উপস্থাপন করে সেখানে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। গত বছরের ২৩ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

একথা সবাই জানে, আমাদের বাজেটে বৈদেশিক সহায়তা নির্ভরতা একদম কমে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ থেকে পাঁচ বছর এবং ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে, ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। যার সাফল্যের আলোতে আজ দেশের অর্থনীতির অলিগলি উদ্ভাসিত। আমাদের বাজেট ও বাইরের সাহায্যের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে সাফল্যের চিত্রটি আরো পরিষ্কার হবে।

সময়ের পরিক্রমায় প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বৈদেশিক সহায়তার ধরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ২০২০ অর্থবছরে প্রাপ্ত মোট বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে প্রকল্প সহায়তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৯.৮৫ শতাংশ। এসময়ে প্রাপ্ত মোট সহায়তার ৯৬.১৩ শতাংশ ঋণ সহায়তা হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণের ফলে বাজেট এবং এডিপি'র আকার সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবকাঠামো উন্নয়ন ও বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে দেশে , যেমন মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা সমুদ্র বন্দর, মাতারবতাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরসহ ১০টি বড়ো প্রকল্প। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় এ ধরনের প্রকল্পে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একটা বড়ো সুসংবাদ হচ্ছে, সরকারের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের জিডিপি, মাথাপিছু আয়, রাজস্ব আহরণের পরিমাণ এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১০ অর্থবছরে ১ হাজার ৫৮৮.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ছাড় হয়েছে এবং ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে ৮৭৫.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২০ অর্থবছরে অর্থ ছাড় হয়েছে ৭ হাজার ১২১.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ঋণ পরিশোধ হয়েছে ১ হাজার ৭৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা থাকায় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য, জিডিপির আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণের স্থিতি জিডিপির শতাংশে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ঋণের স্থিতি ২০০৫-২০০৬ সালে জিডিপির ২৫.৮৭ শতাংশ যা ২০১৯-২০২০ দাঁড়িয়েছে ১৩.৩৪ শতাংশ।

ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা থাকায় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে Debt Sustainability বলতে অর্থনীতির সেই অবস্থাকে বোঝায় , যখন বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার জন্য সামষ্টিক অর্থনীতি অথবা জিডিপির প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হবে না।

১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তার আওতায় অনুদান ছিল সর্বোচ্চ ৮৪-৮৫-৮৬ শতাংশ, ঋণ ছিল ৬ থেকে ৮ শতাংশ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুদান আরও কমে গেছে , ২/৩ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। ৯৭ শতাংশেই আসছে ঋণ হিসেবে।

বাংলাদেশের সবচাইতে ইতিবাচক দিক হচ্ছে, দাতাদেশগুলোর কাছে আমাদের ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্যের যথেষ্ট সুনাম আছে। বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে বিচক্ষণ নীতি অনুসরণ করায় দায়িত্বশীল ঋণ গ্রহীতা হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম আছে এবং বাংলাদেশ কখনোই বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি। গৃহীত ঋণের সমুদয় অর্থ উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করার ফলে ঋণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশ এখন 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' বাস্তবায়নের দিকে এগোচ্ছে। আরো সুদূর পরিকল্পনাও (২১০০ সালের ডেল্টা পরিকল্পনা) দেশের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যার বাস্তবায়নে কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে আপাতত ২০৪১ সালকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়েছে সরকার। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১'।

এর চালিকাশক্তি হিসেবে রয়েছে দুটি প্রধান লক্ষ্য - প্রথমত: ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে ১২ হাজার ৫০০ ডলারের বেশি, দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতে র ঘটনা। এই অভীষ্ট দুটি অর্জনের পথে আগামী দু 'দশকে পরিবর্তন আসবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ, ব্যবসার ধরন এবং কর্ম সম্পাদন পদ্ধতিতে। ধারাবাহিক এই পরিবর্তনের সুফল সমাজের সকল স্তরে সুষম বণ্টনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এই 'ভিশন দলিলে'।

এই দলিলের প্রথম অধ্যায় 'রূপকল্প ২০৪১: একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতি অভিমুখে'-এ 'উদ্দীপনাময় সূচনা' হিসেবে ধারণ করা হয়েছে জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন 'দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা'কে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে আগামী দু'দশকে 'মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)' এর গড় প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৯.০২ শতাংশ হারে। এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নগরের বিস্তার, দক্ষ জ্বালানি ও অবকাঠামো, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ইত্যাদি কৌশলগত কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ।

সবশেষে একটি গৌরবের খবর সংযুক্ত করতে চাই। Economist এর রিপোর্টে কোভিড-১৯ এর প্রভাব সত্ত্বেও আর্থিক অবস্থান বিবেচনায় ৬৬টি উদীয়মান দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯ম। চারটি মানদন্ডের ভিত্তিতে এ র্যাংকিং করা হয়েছে- জিডিপির শতাংশে সরকারি ঋণ; মোট বৈদেশিক ঋণ; Cost of Borrowing; বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বৈদেশিক সহায়তা নিয়ে যারা সমালোচনা করেন তাদের জন্য এটি একটি মোক্ষম জবাব হতে পারে। আমরা বৈদেশিক সহায়তা নির্ভরতা কমিয়ে উন্নত শিরে এগিয়ে চলেছি উন্নত দেশের কাতারে সামিল হতে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু কি তার বড়ো প্রমাণ নয়?

#

১৯.০১.২০২১ পিআইডি ফিচার

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর।